তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে স্বতন্ত্র নিয়ামতও বলা যায় এবং ভূমি সম্পর্কিত নিয়ামতও বলা যায়। কেননা, পানির কেন্দ্রস্থল ভূমিই। এসব নিয়ামত তওহীদকে জরুরী করে। সুতরাং যারা এই সত্য বিষয়কে অর্থাৎ তওহীদ জরুরী হওয়াকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের কতক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) তোমরা সেই আযাবের দিকে চল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে---) চল, তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে---যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উত্তাপ থেকে রক্ষাও করে না। [এখানে জাহান্নাম থেকে নির্গত একটি ধূম্রকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিক্যের কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।---(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা এই ধূম্রকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে নেক বান্দাগণ আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূম্রকুণ্ডলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে]। এটা অট্টালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উত্থিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সুতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অবস্থার দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী) অতঃপর যারা এই সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,] সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকে ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওযর থাকবেই না। যারা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) একত্র করেছি। অতএব অদ্যকার ফলাফল ও বিচার থেকে আত্মরক্ষার কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের মুকাবিলায় মু'মিনদের পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্‌ভীরুগণ থাকবে ছায়ায়, প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে ঃ)। আপন (সৎ) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (কাফিররা জান্নাতের নিয়ামতসমূহকেও মিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবার কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা) তোমরা (দুনিয়াতে) কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্বরই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিশ্চিতই অপরাধী। (অপরাধীদের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শাস্তিকে মিথ্যারোপ করে, তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ নত হও, (অর্থাৎ ঈমান ও দাসত্ব অবলম্বন কর) তখন তারা নত হয় না। (এর

চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হবে। তারা এই অপরাধকেও মিথ্যা মনে করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কোরআনের এসব বর্ণনা শোনা-মাত্রই ভয়ে ঈমান আনা উচিত ছিল। এর পরও যখন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তখন) এরপর (অর্থাৎ প্রাঞ্জলভাষী, সতর্ককারী কোরআনের পর) তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এতে কাফিরদেরকে শাসানো হয়েছে এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিরাশ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিষ্টতায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু সে পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।---(ইবনে কাসীর)

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাবে সেগুলোর স্থলে এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ عاصفات مرسلات-ملقيات الذكر- فارقات - ناشرات - -কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। একারণেই ইবনে জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন ঃ সবই হতে পারে কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতাগণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম

মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা, এতে এই মত অবলম্বন করেই তফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ مرسلات - عاصفات ও ناشرات -কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতানুযায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এই ঃ প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عرفا -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। عرفا -এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عاصفات –শব্দটি عصف –থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ناشرات ---বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা বৃষ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فارقات ---এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নাযিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে। ملقيات الذكر---এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذكر -এর অর্থ কোরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকট ওহী ও কোরআন নাযিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্র কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে---এক. বৃষ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণকর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا—এই আয়াত ملقيات ذكرا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذكر তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা মু'মিনদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওযরখাহীর কারণ হয় এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়।

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এইঃ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ — اُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيْت থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেনঃ এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একত্র করা হবে।

অতঃপর وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। وَيْل শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলা হয়েছে اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামূদ, কওমে লূত, কওমে ফিরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ এক কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কিরাআত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যৎ আযাবের খবর দেওয়া। এই আযাব বদর, ওহূদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আযাব নাযিল হত, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত আর বর্তমান কাফিরদের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আসমানী আযাব আসে না বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আযাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না---কেবল প্রধান অপরাধীরাই নিহত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا---অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য كفات করিনি? كفات শব্দটি كفت থেকে উদ্ভূত এর অর্থ মিলানো। كفات সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ---قصر-এর অর্থ অট্টালিকা। جمالة উটকে বলা হয় এবং صفر শব্দটি اصفر--এর বহুবচন অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صفر -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা, পীতবর্ণ উট কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে---(রূহুল মা'আনী)

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ---অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে---(রূহুল মা'আনী)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ---অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী ; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। ---(আবূ হাইয়ান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ---এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকূর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আল্লাহ্র বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ

কেউ রুকূর পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ---অর্থাৎ তারা যখন কোরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে যখন এই সূরা তিলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার آمَنَّا بِاللّٰهِ বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

سورة النبا

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ : ৪০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝١ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ۝٢ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣ كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٥ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَجَعَلْنَا
النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝١٣ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝١٦ إِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝١٧ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝١٨ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝١٩ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢١
لِلطَّاغِينَ مَآبًا ۝٢٢ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝٢٣ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝٢٤
إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝٢٥ جَزَاءً وِفَاقًا ۝٢٦ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝٢٧ وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝٢٨ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝٢٩ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝٣٠
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝٣١ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝٣٣ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝٣٤
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝٣٥ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝٣٦ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝٣٧ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝٣٨ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

مَاٰبًا ۝ اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ

يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তিদূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ, (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল বস্তু এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। (২৮) এবং আমার আয়াতসমূহতে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ্ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে : হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামত অস্বীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে? তারা সেই

মহা ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করার অর্থ অস্বীকারের স্থলে জিজ্ঞাসা করা। এই প্রশ্ন ও জওয়াবের উদ্দেশ্য বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অস্পষ্ট রেখে পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাদের এই মতবিরোধ ভ্রান্ত। তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং কিয়ামত আসবে এবং) তারা সত্বরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন তারা আযাবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিয়ামতের সত্যতা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। আমি পুনশ্চ বলছি তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না) কখনও এরূপ নয় (বরং আসবে এবং) সত্বরই তারা জানতে পারবে। (কাফিররা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাই অতঃপর তার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অসম্ভব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অস্বীকার করা বিস্ময়কর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক ? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে যেমন তা স্থানচ্যুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে স্থিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামের বস্তু। আমিই রাত্রিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের ঊর্ধ্বে মজবুত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। আমিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ সূর্য। অন্য আয়াতের আছে وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) আমিই জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তদ্দ্বারা শস্য, উদ্ভিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিয়ামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অস্বীকার করা হয় ? অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সৎ কর্মপরায়ণ, অসৎ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে যাবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জায়গা খুলে যায়, তেমনি আকাশের অনেক জায়গা খুলে যাবে। সুতরাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বস্তুত দরজা তো আকাশে এখনও আছে---একথা বলে আর আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোলা ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য হবে। সূরা ফোরকানে একেই تَشَقَّقُ السَّمَاءُ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে (যেমন অন্য আয়াতে كَثِيبًا مَهِيلًا বলা হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার সময় সংঘটিত

হবে। তবে পর্বতমালা চালনার ঘটনাটি যে জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই উভয়বিধ সম্ভাবনা রয়েছে---দ্বিতীয় বার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে। দ্বিতীয় ফুঁকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজস্ব আকৃতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে ভূমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে ভূমির উপর কোন আড়াল না থাকে এবং একই সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম ফুঁকের মূল উদ্দেশ্যই সবকিছু ধ্বংস করা। প্রথম ফুঁক থেকে দ্বিতীয় ফুঁক পর্যন্ত সময়কে একই দিন ধরে নিয়ে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের বিচার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাগণ ওঁত পেতে থাকবে যে, কাফির আসলেই তাকে ধরে আযাব দেওয়া শুরু করবে। এটা) অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল। তারা তথায় অশেষকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারা তথায় কোন শীতলবস্তু (অর্থাৎ আরামদায়ক বস্তু) এবং পানীয় আস্বাদন করবে না (ফলে তৃষ্ণা নিবারিত হবে না) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। এটা (তাদের) পুরোপুরি প্রতিফল। (যে সব কাজের এটা প্রতিফল তা এই যে) তারা (কিয়ামতের) হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং (হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য সত্য বিষয় সম্বলিত) আমার আয়াতসমূহতে মিথ্যারোপ করত। আমি (তাদের কর্মসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে ঃ এখন এসব কর্মের) স্বাদ আস্বাদন কর ; আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (অতঃপর মু'মিনদের ফয়সালা উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য রয়েছে সাফল্য অর্থাৎ (আহার ও ভ্রমণের জন্য) উদ্যান (তাতেও নানারকম ফলমূল থাকবে), আঙ্গুর (গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য) সমবয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুণী এবং (পান করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। (কেননা তথায় এগুলো থাকবে না)। এটা প্রতিদান, যা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট পুরস্কার ---যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, (যিনি) দয়াময়। কেউ (স্বেচ্ছায়) তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। যেদিন সকল রূহ্‌ধারী ও ফেরেশতা (আল্লাহ্‌র সামনে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, (সেদিন) দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ যে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাও সীমিত হবে---যা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না। অতঃপর উল্লিখিত সব বিষয়-বস্তুর সারমর্ম বলা হয়েছে)। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার কাছে (নিজের) ঠিকানা তৈরী করুক (অর্থাৎ ভাল ঠিকানা পেতে হলে ভাল কাজ করুক। লোকসকল) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। (এই শাস্তি এমন দিনে সংঘটিত হবে) যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত) দেখে নিবে এবং কাফির (পরিতাপ করে) বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (তাহলে আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। চতুষ্পদ জন্তুদেরকে যখন মৃত্তিকায় পরিণত করে দেওয়া হবে, তখন কাফিররা একথা বলবে)।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ—অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন ঃ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ—نبا শব্দের অর্থ মহা খবর। এখানে মহা খবর বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফিররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফিররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফিরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফিররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফিরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য দুবার উল্লেখ করেছে— كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ—অর্থাৎ কিয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا—سبات শব্দটি سبت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি

দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না। একারণেই কেউ কেউ سباتا-এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত। নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মুর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এই নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোষক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোষক, বালিশ অথবা প্রাসাদ-বাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোন শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এই নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায়শ এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا —অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ঈশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই এক-যোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হত ; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا —মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে

যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছেঃ তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছেঃ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا—অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এর পর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا—معصرات শব্দটি معصرة-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سماء শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا—অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবু যর গিফারী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আয়াতের তফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا—অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বস্থান থেকে বিচ্যুত

হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سراب -এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলমল করতে থাকে তাকেও سراب -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়।——(সেহাহ্, রাগিব)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا —যে স্থানে বসে কারও দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مرصادا বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। (মাযহারী)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে।—(কুরতুবী)

لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا—এটা اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خبر উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। طاغين শব্দটি طاغى এর বহুবচন এবং طغيان থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طاغى এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طاغى অর্থ কাফির। কু-বিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোর-আন ও সুন্নাহ্‌র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়।——(মাযহারী)

لٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا — لابثين শব্দটি لابث -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। احقاب শব্দটি حقبة -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জরীর হযরত আলী (রা) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حقبة হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।——(ইবনে-কাসীর) কিন্তু মসনদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يخرج احدكم من النار حتى يمكث فيها احقابا والحقب بضع وثمانون سنة كل سنة ثلثمائة وستون يوما مما تعدون -

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্‌বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—(মাযহারী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর না হলেও এতে احقاب শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুক্‌বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম বায়যাভী احقاب-এর অর্থ করেছেন دهورا متتابعة অর্থাৎ উপর্যুপরি বহু বছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জওয়াব ঃ হুক্‌বার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফির জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফিররা কখনও জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যদি জাহান্নামী-দেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতী-দেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে।—(মাযহারী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের احقابا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুক্‌বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শুধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কয়েক হুক্‌বার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদের জন্য কোন সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্দ্বারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) কাতাদাহ্ থেকেও এই তফসীরই

বর্ণনা করেছেন যে, احقابا -এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্‌বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্‌বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এখানে ويحتمل বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طاغين -এর অর্থ কাফির না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তওহীদ পন্থী লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা কয়েক হুক্‌বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাযহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মসনদে বাযযার বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا—এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طاغين -এর অর্থ এখানে তওহীদ পন্থী ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মনসূখ বা রহিত।

একদল তফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতটি احقابا থেকে جملة حالية হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোন শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আযাব হতে পারে। حميم এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্‌ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غساق—জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

جَزَآءً وِّفَاقًا—অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায়

ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا—অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আযাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের সওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا—অর্থাৎ জান্নাতের এসব নিয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্র দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোন কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কোরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান—প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহ্র দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حسابا শব্দে অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে—এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে— احسبت فلانا اى اعطيته ما يكفيه حتى قال حسبى অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মুকাবিলা করণ। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন—এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসাবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবায়ে কিরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহ্র পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ — لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا—এই বাক্য পূর্বের جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا—কোন কোন তফসীরকারের মতে 'রূহ্' বলে এখানে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ—বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে।—(মাযহারী)

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সে দিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবেঃ মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম।

সূরা নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿٣﴾ فَالسّٰبِقٰتِ
سَبْقًا ۙ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿٧﴾
قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْ
دُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ؕ﴿١٠﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿١١﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ﴿١٤﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ
﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ﴿١٦﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ﴿١٧﴾
فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ﴿١٨﴾ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ۖ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا
رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّخْشٰى ؕ﴿٢٦﴾ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا
فَسَوّٰىهَا ۙ﴿٢٨﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ؕ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ
مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ﴿٣٣﴾ فَاِذَا
جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ
لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ﴿٣٩﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ
مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟
إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাধন খুলে দেয় মৃদুভাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের, যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—কিয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী; (৮) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। (৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে ঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই—(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! (১৩) অতএব এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (১৫) মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি ? (১৬) যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি ? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল (২৪) এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান

হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা (কাফিরদের) প্রাণ নির্মমভাবে বের করে। শপথ তাদের, যারা (মুসলমানদের আত্মা মৃদুভাবে বের করে যেন) বাঁধন খুলে দেয়। শপথ তাদের, যারা (আত্মাকে নিয়ে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয় যেন) সন্তরণ করে। অতঃপর (যখন আত্মাকে নিয়ে পৌঁছে, তখন আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে) দ্রুত অগ্রসর হয়, অতঃপর (এই আত্মা সম্পর্কে সওয়াবের আদেশ হোক অথবা আযাবের, উভয়) কার্য নির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বলেন যে) কিয়ামত অবশ্যই হবে, যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুঁক)। অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী (অর্থাৎ শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক)। অনেক হৃদয় সেদিন ভীত-বিহবল হবে, তাদের দৃষ্টি (অনুতাপের ভারে) নত হবে। (কিন্তু তারা এখন কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হব? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবন হবে কি? উদ্দেশ্য, এটা কিরূপে হতে পারে?) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি? (উদ্দেশ্য, এটা খুবই কঠিন। যদি এরূপ হয়) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন (আমাদের জন্য) সর্বনাশা হবে। (কারণ, আমরা তো এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করা যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে সতর্ক করে বলে ঃ এ পথে যেয়ো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি অস্বীকারের ছলে কাউকে বলে ঃ ভাই, সে দিকে যেয়ো না, সিংহ খেয়ে ফেলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করে) অতএব, (তারা বুঝে নিক যে, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয়; বরং) এটা তো কেবল এক মহানাদ হবে, যার ফলে তারা তৎক্ষণাৎ ময়দানে আবির্ভূত হবে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মূসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] আপনার কাছে মূসা (আ)-র বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেন যে, তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। তার কাছে যেয়ে বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (তোমার সংশোধনের নিমিত্ত) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার (সত্তা ও গুণাবলীর) দিকে পথ দেখাব, যাতে (তাঁর সত্তা ও গুণাবলী শুনে) তুমি তাঁকে ভয় কর। [এই ভয়ের ফলশ্রুতিতে তোমার সংশোধন হয়ে যাবে। এই আদেশ শুনে মূসা (আ) তার কাছে গেলেন এবং পয়গাম পৌঁছালেন] অতঃপর (সে যখন নবুয়তের নিদর্শন

চাইল, তখন) তিনি তাকে মহানিদর্শন (নবুয়তের) দেখালেন (অর্থাৎ লাঠি অথবা লাঠিও সুশুভ্র হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ফিরাউন) মিথ্যারোপ করল ও অমান্য করল। অতঃপর [মূসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রস্থান করল এবং (তাঁর বিরুদ্ধে) চেষ্টা করল। সে (সকলকে) সমবেত করল এবং (তাদের সামনে) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। ('সেরা' কথাটি এমনিতেই প্রশংসার্থে যোগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য আরও পালনকর্তা আছে)। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন (ইহকালের শাস্তি নিমজ্জিত করা এবং পরকালের শাস্তি জাহান্নামে প্রজ্বলিত করা)। নিশ্চয় এতে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (অতঃপর কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করার যুক্তিগত জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তোমাদের (পুনর্বার) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের ? (এটা অন্যের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র পক্ষে সব সৃষ্টিই সমান। বলা বাহুল্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই যখন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অতঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে)। আল্লাহ্ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন, (যাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিদ্র ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (আকাশের রাত্রি ও আকাশের সূর্যালোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারা দিবারাত্রি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ত)। এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (আসল প্রমাণ ছিল আকাশ সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবী সর্বদা দৃষ্টির সামনে থাকে বলে সম্ভবত এর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সারমর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? অতঃপর পুনরুত্থানের পর দান প্রতিদানের বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছ)। অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং (পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে) পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে থাকাকালে) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করেছে (ফলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাসসহ সৎ কর্মও সম্পাদন করেছে) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সৎ কর্ম জান্নাতের পথ। এর উপর জান্নাত নির্ভরশীল নয়। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (কেননা, জানা থাকলেই বর্ণনা করা যায়। অথচ আমি এর নির্দিষ্ট সময় কাউকে বলিনি ; বরং) এর চরম জ্ঞান শুধু আপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। আপনি তো কেবল

(সংক্ষিপ্ত খবরের ভিত্তিতে) এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেন, যে একে ভয় করে (এবং ভয় করে ঈমান আনে। যারা কিয়ামতের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন (তাদের) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র একদিনের শেষাংশ অথবা এক দিনের প্রথমাংশ অবস্থান করেছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘজীবন খাটো মনে হবে। তারা মনে করবে আযাব বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছে। সার কথা এই যে, তড়িঘড়ি কর কেন? যখন আসবে, তখন মনে করবে যে, দ্রুত এসে গেছে। তোমরা এখন যাকে বিলম্ব মনে করছ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا—نازعات-শব্দটি نزع--থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুকে উৎপাটন করা। غرق ও اغراق –এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা। বাক-পদ্ধতিতে বলা হয় ঃ اغرق النازع فى القوس— অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ---অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আযাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফিরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাফিরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا—ناشطات -শব্দটি نشط থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া

হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে—কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে—যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফিরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا — سبح-এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণ-টিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا — উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌঁছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফিরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا — মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াব ও আযাব ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ্ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌঁছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াব অথবা আযাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আযাব ও সওয়াব কবরে অর্থাৎ বরযখে হবে। হাশরের আযাব ও সওয়াব এর পরে হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র উপাদেয় বক্তব্য ঃ তফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে

উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ্ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূহ্ একটি অশরীরী আল্লাহ্র নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ্। কারণ, দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফ্সের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফ্সকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আযাব এবং সওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের সওয়াব এবং আযাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ্ কবরে থাকে কথাটি নফ্স কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফ্স রূহ্ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ্ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তি ও তার জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ — ساهرة

অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই ساهرة বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী

পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى — نَكَال -শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হল ফিরাউনের পরকালীন আযাব এবং نَكَالَ الْاُوْلٰى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফিরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আল্লাহ্‌র রহমতে কোন কোন জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌঁছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে। فَاَمَّا مَنْ طَغٰى

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا——এক. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করা। দুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আযাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَاِنَّ

الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى—অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে : وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى—এক. দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুই. অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয়ঃ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى— অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিন স্তরঃ আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোন গোনাহ্ করার সময় আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন জায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিশিষ্ট। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েয ও নাজায়েয উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েয না নাজায়েয। উদাহরণত জনৈক রুগ্ন ব্যক্তি অযু করতে সক্ষম কিন্তু অযু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশী কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েয কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চক্রান্তঃ যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেয়াল-খুশী এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল হয়ে যায়। রিয়া, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ্ ও খেয়াল-খুশী, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে

সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও সর্বাধিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন ঃ আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও অন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোযা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অন্ধকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোযা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহ্‌মানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীর বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশী তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেন ঃ খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ে যে রোযা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেছেন। তখন আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, যিক্‌র-আযকার ও নফল ইবাদতে কোন শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা, শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আরয করলাম, হযরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়, এরূপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন ঃ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইস্তেগফার করা উচিত। কেননা, রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মলিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার ইস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক যিক্‌র, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশীর চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীত্বের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণীর ওলীগণের সম্পর্কেই কোরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ —অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به —অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে যায়।

কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতা অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবী অসার।

سورة عبس

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪২ আয়াত, ১ রুকূ’

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى (١) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى (٢) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى (٣) اَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى (٤) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى (٥) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى (٦) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا
يَزَّكّٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى (٨) وَهُوَ يَخْشٰى (٩) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (١٠) كَلَّآ اِنَّهَا
تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (١٢) فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِاَيْدِيْ
سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ (١٧) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ (١٨)
مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ (١٩) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ (٢٠) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ (٢١) ثُمَّ
اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ (٢٤)
اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (٢٧) وَّعِنَبًا
وَّقَضْبًا (٢٨) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا (٢٩) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا (٣٠) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا (٣١) مَّتَاعًا
لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ (٣٢) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ (٣٤)
وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ
يُّغْنِيْهِ (٣٧) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবূল করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ, পবিত্র পত্রসমূহ, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহত, পূতঃ চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর, শাক-সবজি, (২৯) যয়তুন, খর্জুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির পাপিষ্ঠের দল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াত অবতরণের কাহিনী এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে বসে কিছু মুশরিক সরদারকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের এই নামও বর্ণিত আছে—আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রবীয়া, উবাই ইবনে খল্ফ, উমাইয়া ইবনে খল্ফ। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। এই বাক্য বিরতিতে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং তার দিকে তাকালেন না। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। যখন তিনি মজলিস ত্যাগ করে গৃহে রওয়ানা হলেন, তখন ওহীর লক্ষণাদি ফুটে উঠল এবং আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল। এই ঘটনার পর যখনই এই অন্ধ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন, তখনই তিনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।—(দুররে মনসূর) আয়াতে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

পয়গম্বর (সা) ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং তাকালেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (এখানে অনুপস্থিত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। এতে বক্তার চরম দয়া ও অনুকম্পা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দোষারোপ করা হয়নি। অতঃপর বিমুখতার সন্দেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাচ্যে বলা হচ্ছেঃ) আপনি কি জানেন যে (অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী আপনার শিক্ষা দ্বারা) হয়তো (পুরোপুরি) শুদ্ধ হত অথবা (কমপক্ষে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার (কিছু না কিছু) উপকার হত। পরন্তু যে ব্যক্তি (ধর্ম থেকে) বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল হন। অথচ সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (তার বেপরোয়া ভাব উল্লেখ করে তার প্রতি বেশী মনোযোগী না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে ব্যক্তি আপনার কাছে (দীনের আগ্রহে) দৌড়ে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আপনি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। [এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনস্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সা) কুফরের তীব্রতাকে গুরুত্বের কারণ মনে করেছেন। উদাহরণত যদি ডাক্তারের কাছে একজন কলেরা রোগী ও একজন সর্দিরোগী একই সময়ে উপস্থিত হয়, তবে কলেরা রোগীর চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার উক্তির সারমর্ম এই যে, রোগের তীব্রতা তখনই গুরুত্বের কারণ হবে, যখন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্তু গুরুতর রোগী যদি চিকিৎসা প্রত্যাশীই না হয় বরং চিকিৎসার বিরোধিতা করে, তবে যে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে যদিও তার রোগ খুব হাল্কা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোযোগী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছেঃ আপনি ভবিষ্যতে] কখনও এরূপ করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিছক একটি) উপদেশবাণী। (আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে কবূল করবে। (যে কবূল করবে না, তার কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? অতঃপর কোরআনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ কোরআন লওহে মাহ্‌ফূযের) সম্মানিত, (অর্থাৎ পছন্দনীয় ও মকবুল) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (কেননা, লওহে মাহ্‌ফূয আরশের নিচে অবস্থিত) পবিত্র সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্মতি শয়তান সেখানে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ বলেনঃ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ মহৎ ও পূতঃ চরিত্র লিপিকারদের (অর্থাৎ ফেরেশতাগণের) হস্তে।

[এসব গুণ জ্ঞাপন করে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। লওহে-মাহফূযে একই বস্তু। কিন্তু এর অংশসমূহকে সুহুফ (সহীফাসমূহ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে লওহে মাহ্‌ফূয থেকে লিপিবদ্ধ করে। আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আপনি উপদেশ শুনিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন—কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর কাফিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে] মানুষ (অর্থাৎ কাফির মানুষ, যারা এহেন উপদেশবাণী দ্বারা উপকৃত হয় না, যেমন আবূ জাহ্ল প্রমুখ। তারা) ধ্বংস হোক। সে কত অকৃতজ্ঞ! (সে দেখে না যে) আল্লাহ্ তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, (অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশস্ত জায়গা দিয়ে এমন সুঠাম শিশুর নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসা আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তিমত্তাই জ্ঞাপন করে)। অতঃপর (বয়স শেষ হলে) তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র এসব কর্ম প্রমাণ করে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁর নিয়ামত ভোগ করে। সুতরাং তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা জরুরী ছিল। কিন্তু) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি এবং তিনি যে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ (তার সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আয়েশ করার উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করুক। উদাহরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (যাতে তা কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও ঈমান আনার কারণ হয়। অতঃপর লক্ষ্য করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। (কিছু) তোমাদের ও (কিছু) তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (এগুলো নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ। এগুলোর প্রত্যেকটি কৃতজ্ঞতা ও ঈমান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ কবূল না করার শাস্তি ও কবূল করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অকৃতজ্ঞতা ও কুফর করে) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হবে, তখন সব অকৃতজ্ঞতার মজা টের পেয়ে যাবে। অতঃপর সেদিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে) সেদিন (উপরে বর্ণিত) মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا —কারণ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে অপর থেকে নির্লিপ্ত রাখবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন (ঈমানের কারণে) উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন কুফরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফির, পাপাচারীর দল। (কাফির বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসী এবং পাপাচারী বলে ভ্রান্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে-মকতুম (রা)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন।

তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আওয়ায দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়ায দেন।---(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মক্কার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-র এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। এর বিপরীত কোরায়েশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন أَعْمَىٰ -শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওযর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায়

যে, কোন অপারক ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى —প্রথম শব্দের অর্থ রুক্ষতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيكَ (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওযরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى —অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذكرى-শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌কে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা।—(সিহাহ্)

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— يزكى ও يذكر — প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুদের স্তর। যারা নফ্‌সকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আল্লাহ্‌র পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিয়োজিত করা হয়- -যাতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতই—প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। —(মাযহারী)

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোরআনী মূলনীতিঃ এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়—১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোযোগ। কোরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যদ্দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেনঃ

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو
دیر والے کج ادا کہدیں یہ بدنامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহ্‌কে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ — صحف বলে লওহে মাহ্‌ফুয বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহু-বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة-বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مطهرة-বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অযুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ — سفرة-শব্দটি سافر এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ

হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর তফসীর।

سفرة-শব্দটি سفير-এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কিরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিরা'আতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কিরা'আত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কিরা'আতের সওয়াবও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাযহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন ঃ مِنْ نُطْفَةٍ—অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ—অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهُ-শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, ২. তার বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং ৪. পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।—(বুখারী, মুসলিম)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার অপার

শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীসালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ—নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ—এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র উপরোক্ত নিদর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ—صَاخَّةٌ এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ— এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন

দিতে কুন্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে—পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফিরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

سورة التكوير

সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ১ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا
الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوْسُ
زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣)
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ (١٤) فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَالَّيْلِ
إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِيْ قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (٢٢)
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٢٧) لِمَنْ شَآءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ (٢٨) وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٩)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে; (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জান্নাত, সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমনকালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র খসিত হবে, যখন পর্বতমালা চালিত হবে যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য জন্তুরা (অস্থির হয়ে) একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (এই ছয়টি ঘটনা প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার সময় হবে। তখন দুনিয়া জনবসতিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুঁকের ফলে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উষ্ট্রী ইত্যাদিও স্ব-স্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং কতকগুলো উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হবে। এ ধরনের উষ্ট্রী আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তারা সর্বক্ষণ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কারও কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য থাকবে না। বন্য জন্তুরাও অস্থির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সমুদ্রে প্রথমে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে এবং ভূমিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। ফলে সব মিষ্ট ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাবে। وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উত্তাপের আতিশয্যে সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সম্ভবত প্রথমে বায়ু হয়ে পরে অগ্নি হয়ে যাবে। এরপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যে ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাগুলো এই) যখন এক এক শ্রেণীর লোককে একত্র করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার লোক আলাদা আলাদা)। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? (এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা) যখন আমলনামা খোলা হবে (যাতে সবাই নিজ নিজ আমল দেখে নেয়; যেমন অন্য আয়াতে আছে : يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) যখন আকাশ খুলে যাবে, (ফলে আকাশের উপরিস্থিত বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে। এছাড়া আকাশ খুলে যাওয়ার ফলে ধূম্ররাশি বর্ষিত হতে থাকবে يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ -আয়াতে

যার উল্লেখ করা হয়েছে)। যখন জাহান্নাম (আরও বেশী) প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে (প্রথম ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁকের এসব ঘটনা যখন সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন) প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। (এই হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন হবে, তখন আমি অবিশ্বাসীদেরকে এর স্বরূপ বলে দিচ্ছি এবং বিশ্বাসীদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করছি। কোরআন মেনে নিলে এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম করলে এই উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কোরআনে এর প্রমাণ এবং মুক্তির পন্থা আছে। তাই) আমি শপথ করি সেসব নক্ষত্রের, যেগুলো (সোজা চলতে চলতে) পশ্চাতে সরে যায় (অতঃপর) পশ্চাতেই (চলমান হয় এবং পশ্চাতে চলতে চলতে এক সময় উদয়াচলে) অদৃশ্য হয়ে যায়। (পাঁচটি নক্ষত্র এরূপ করে। এগুলো কখনও সোজা চলে, কখনও পশ্চাতে চলে। এরা হচ্ছে শনি, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ)। শপথ নিশা অবসান ও প্রভাত আগমন কালের, (অতঃপর জওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে) এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর আনীত কালাম, যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাশীল, সেখানে (অর্থাৎ আকাশে) তাঁর কথা মান্য করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা তাঁকে মানে। মি'রাজের হাদীস থেকেও একথা জানা যায়। তাঁর আদেশেই ফেরেশতাগণ আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং তিনি) বিশ্বাসভাজন (তাই বিশুদ্ধ-ভাবে ওহী পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর যার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ) তোমাদের সাথী [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যার অবস্থা তোমরা জান] উন্মাদ নন (নবুয়ত অস্বীকারকারীরা তাই বলত)। তিনি ফেরেশতাকে (আসল আকৃতিতে আকাশের) পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেনও (পরিষ্কার দিগন্ত অর্থ উর্ধ্বদিগন্ত, যা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সূরা নজমে আছে وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ)। তিনি অদৃশ্য (অর্থাৎ ওহীর) বিষয়াদিতে কৃপণতা করেন না (অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাই করত। তারা অর্থের বিনি-ময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করত। এতে করে যেন বলা হয়েছে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং নিজের কাজের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। [এতে পূর্বোক্ত 'অতীন্দ্রিয়বাদী' নন কথাটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। সারকথা এই যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন, অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং অর্থলোভীও নন। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে চিনেনও। এই ফেরেশতাও অনুরূপ গুণ-সম্পন্ন। সুতরাং এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ্‌র কালাম এবং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা) উপরোক্ত শপথগুলো উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। নক্ষত্রসমূহের সোজা চলা, পশ্চাৎগামী হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া ফেরেশতার আগমন-নির্গমন ও উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে মিল রাখে এবং নিশার অবসান ও প্রভাতের আগমন কোরআনের কারণে কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া এবং হিদায়ত জ্যোতির আগমনের অনুরূপ]। অতএব তোমরা (এ ব্যাপারে) কোথায় চলে যাচ্ছ (এবং কেন নবুয়ত অস্বীকার করছ)? এটা তো (সাধারণভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (এবং বিশেষভাবে) এমন ব্যক্তির জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলার ইচ্ছা করে। (কোরআন সোজা পথ বলে দেয়, এদিক

দিয়ে কোরআন সাধারণ লোকদের জন্য হিদায়ত এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত এই অর্থে যে, তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। কেউ কেউ কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করে না, এতে কোরআন উপদেশবাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কেননা) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপদেশবাণী ঠিকই কিন্তু এর কার্যকারিতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কতকের জন্য হয় এবং কতকের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ—تكوير-এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (র) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (র) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মসনদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ—انكدار-এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ—আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—تسجير-এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে।— (মাযহারী)

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ—অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফির এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফির এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফিরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিন-দেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদ-কারী গাযীগণ এক জায়গায় এবং সদ্কা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচা-রীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً—আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ—مَوْءٗدَةٌ-এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহ্র কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يوم الحساب (হিসাব দিবস), يوم الجزاء (প্রতিদান দিবস) ও يوم الدين (বিচার দিবস)।

এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই; বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোন সাক্ষ্য নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল ঃ শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারকতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।—(মাযহারী)

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একেও وا د خفى—অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন।—(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যদ্দ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরীয়তে কোনক্রমেই এর অনুমতি নেই।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ—كشط-এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كشط -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ—অর্থাৎ কিয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে

প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম---সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে---আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কোরআন সত্য এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খুব হিফাযত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خمسة متحيرة - (অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ ---অর্থাৎ এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার আশংকা নেই। এখানে رسول كريم বলে বাহ্যত জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে ঃ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে امين -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ رسول امين -এর অর্থ নিয়েছেন, মুহাম্মদ (সা)। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য এবং কাফিরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উন্মাদ বলত,

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ—অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছেঃ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى—এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

سورة الانفطار

সূরা ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৯ আয়াত রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُوْرُ
بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥ يٰأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ
رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠ كِرَامًا
كَاتِبِيْنَ ۝١١ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ
لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝١٤ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ۝١٦ وَمَا
أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝١٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উম্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে (১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে

জাহান্নামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ (খসে) ঝরে পড়বে, যখন (মিঠা ও লোনা) সমুদ্র উদ্বেলিত হবে (এবং একাকার হয়ে যাবে; যেমন পূর্বের সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাত্রয় প্রথম ফুঁকের সময়কার। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁকের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে ঃ) যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে (অর্থাৎ ভিতর থেকে মৃতরা বের হয়ে আসবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে পিছের কর্ম জেনে নেবে। (এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল গাফিলতির নিদ্রা পরিহার করা। কিন্তু মানুষ তা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছে ঃ) হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভব পালনকর্তা থেকে বিভ্রান্ত করল, যিনি তোমাকে (মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাকে সুষম করেছেন অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। কখনও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, (কিন্তু তোমরা বিরত হচ্ছ না) বরং (এতটুকু অগ্রসর হয়েছ যে) তোমরা প্রতিদান ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছ। (অথচ এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি দূর হতে পারত। তোমাদের এই মিথ্যা বলাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে) তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে (তোমাদের ক্রিয়াকর্ম স্মরণ রাখার জন্য। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কর, তারা তা জানে (এবং লেখে। সুতরাং কিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে—তোমাদের কুফর ও মিথ্যা মনে করাও এতে থাকবে। অতঃপর উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে) সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা (অর্থাৎ কাফিররা) থাকবে জাহান্নামে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভয়াবহতা প্রকাশ করা)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সব কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ—অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি

অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ —অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয়-পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছেঃ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ—

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ -হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হল? এখানে كريم -শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ — পূর্ববর্তী عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ —আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ —অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্য চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا —অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবূল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

سورة التطفيف

সূরা তাৎফীফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩৬ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ
عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ
لَفِي سِجِّينٍ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ٨ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بَلْ رَانَ
عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٧
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ١٩ كِتَابٌ
مَّرْقُومٌ ٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنظُرُونَ ٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ٢٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ
مَّخْتُومٍ ٢٥ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ٢٦ وَمِزَاجُهُ مِن
تَسْنِيمٍ ٢٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٢٨ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا يَضْحَكُونَ ٢٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ

انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে! (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যা-রোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমা-লংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হলে সে বলেঃ পুরাকালের উপকথা! (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? (২০) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরি। এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্য-শীলগণ। (২৯) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য বড় দুর্ভোগ, তারা যখন লোকের কাছ থেকে (নিজেদের প্রাপ্য) মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (অবশ্য লোকদের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিন্দনীয় নয় কিন্তু এ কাজের নিন্দা করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং কম দেওয়ার নিন্দাকে জোরদার করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কম দেওয়া যদিও এমনিতে নিন্দনীয় কিন্তু এর সাথে অপরের এতটুকুও খাতির না করা আরও বেশী নিন্দনীয়। যে অপরের খাতির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি গুণও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষ গুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার নিন্দা করা, তাই মাপ ও ওজন উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় নেওয়া এমনিতে দূষণীয় নয়; তাই এক্ষেত্রে মাপ ও ওজন উভয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং মাপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরবে মাপের প্রচলনই বেশী ছিল; বিশেষত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হলে—যেমন, রূহুল মা'আনী বর্ণনা করেছেন—এই কারণ, আরও সুস্পষ্ট। কেননা, মদীনায় মাপের প্রচলন মক্কার চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর যারা এরূপ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা এক মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সব মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে ভয় করা উচিত এবং মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদানের কথা শুনে মু'মিন-গণ ভীত হয়ে গেল এবং কাফিররা অস্বীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা যেমন প্রতি-দান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে) কখনও (এরূপ) নয়; (বরং প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্য-ম্ভাবী এবং যেসব কর্মের কারণে প্রতিদান ও শাস্তি হবে তাও সুনির্দিষ্ট। এর বিবরণ এই যে) পাপাচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে [এটা সপ্তম যমীনে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এটা কাফিরদের আত্মারও স্থান।—(ইবনে কাসীর, দুররে মনসূর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রশ্ন করা হয়েছে:] আপনি জানেন সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত খাতা। [চিহ্নিত মানে মোহরকৃত—(দুররে মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারকথা এই যে, কর্মসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হল যে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই যে] সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোগ হবে। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা-রোপ করে। একে তারাই মিথ্যারোপ করে, যারা সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ। তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে: এগুলো সেকালের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা যে, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ এবং কোরআন অস্বীকারকারী। তারা একে মিথ্যা বলছে) কখনও এরূপ নয়, (তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই) বরং (আসল কারণ এই যে) তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়েছে। (এর কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অস্বীকার করছে। তারা যেমন মনে করছে) কখনও এরূপ নয়। (তাদের দুর্ভোগ

এই যে) তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (শুধু তাই নয়; বরং) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (তারা নিজেদের শাস্তিকে যেমন মিথ্যা মনে করত। তেমনি মু'মিন-গণের প্রতিদানকেও মিথ্যা মনে করত। তাই হুঁশিয়ার করা হয়েছে) কখনও এরূপ নয়; (বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে। তা এরূপ যে) সৎলোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। [এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এখানে মু'মিনগণের আত্মা থাকে।---(ইবনে কাসীর) অতঃপর বোঝাবার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছেঃ] আপনি জানেন ইল্লিয়্যীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা একটা চিহ্নিত খাতা। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে (আগ্রহভরে) দেখে। (এটা মু'মিনের বিরাট সম্মান। রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যখন ফেরেশতাগণ মু'মিনদের রূহ্ কবজ করে নিয়ে যায়, তখন প্রত্যেক আকা-শের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সাথী হয়ে যায়। অবশেষে সপ্তম আকাশে পৌঁছে রূহ্টি রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার আমলনামা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর আমলনামা খুলে দেখানো হয়)। সৎলোকগণ খুব স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। সিংহাসনে বসে (জান্নাতের দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। (হে পাঠক) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে, যার মোহর হবে কস্তুরি। আকাঙ্ক্ষাকারীদের এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জান্নাতের নিয়ামতরাজি হোক, আকাঙ্ক্ষা করার জিনিস এগুলোই---দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সৎকর্ম দ্বারাই সেসব নিয়ামত অর্জিত হয়। অতএব, এ ব্যাপারে চেষ্টিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশিয়ে পান করত। জান্নাতের শরাবে তসনীমের পানি মিশানো হবে)। তসনীম এমন একটি ঝরনা, যার পানি নৈকট্যশীলগণ পান করবে। [উদ্দেশ্য এই যে, নৈকট্যশীলগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ শরাবে মিলিত অবস্থায় এর পানি পাবে।---(দুররে মনসূর) শরাবে মোহর করা সম্মানের আলামত। নতুবা জান্নাতে এ ধরনের হিফাযতের প্রয়োজন নেই। জান্নাতে শরাবের পাত্রের মুখে গালার পরিবর্তে কস্তুরি লাগিয়ে মোহর করা হবে। উভয়পক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে]। যারা অপরাধী (অর্থাৎ কাফির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘৃণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বা-সীরা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও উপহাস করতে করতে ফিরত। (উদ্দেশ্য এই যে, সামনে-পশ্চাতে সর্বাবস্থায় ঠাট্টাবিদ্রূপই করত। তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় বিদ্রূপ করত)। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চিতই এরা পথভ্রষ্ট। (কারণ, কাফিররা ইসলামকে পথভ্রষ্টতা মনে করত)। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল। তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মশগুল হল কেন? অতএব তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে পতিত ছিল---এক. সত্যপন্থীদেরকে উপহাস করা এবং দুই. শুদ্ধি

চিন্তা না করা।) অতএব, আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করবে, সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে।—[দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন খিড়কী ও জানালা দিয়ে জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্দশা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে তাদেরকে উপহাস করবে]। বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তাৎফীফ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ (রা) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাৎফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।—(মাযহারী)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ—تَطْفِيفٌ-এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مُطَفِّفٌ- কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تَطْفِيفٌ -কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও تَطْفِيفٌ-এর অন্তর্ভুক্ত ঃ কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تَطْفِيفٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত উমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকূ-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন ঃ لَقَدْ طَفَّفْتَ -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تَطْفِيفٌ-করেছ।

এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র) বলেনঃ لكل شيئ وفاء وتطفيف - অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও অযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تطفيف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অনবধানতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ خمس بخمس -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি—১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন।—(কুরতুবী)

তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেনঃ যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ্ তাদের রিযিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ্ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন।--(মাযহারী)

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিযিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায়ঃ হাদীসে বর্ণিত রিযিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে—১. রিযিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিযিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না; যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হতে পারে—১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয় বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশী মুখাপেক্ষী, সে ততবেশী দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

ক্রয় করতে পারে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশী যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে চাপরাশীদের পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পর-মুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন ঃ كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ — سجين-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামূসে আছে— سجين -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سجين -এর একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফিরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফিরদের কর্মসমূহ লিপি-বদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এসম্পর্কে বারা ইবনে আযেব (রা)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত।—(মাযহারী) কোন কোন হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফির ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল ঃ বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ জাহান্নামকে সপ্তম যমীন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম যমীনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম।—(মাযহারী)

كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ — এস্থলে مرقوم-এর অর্থ مختوم -(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাসীর (র) বলেন ঃ এটা সিজ্জীনের তফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتَابَ الْفُجَّارِ—এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফির ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখানেই কাফিরদের রূহ্ জমা করা হবে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ — রান -শব্দটি رَيْن -থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মু'মিন ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ করে যায়, তবে এই কাল দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم —বলা হয়েছে।—(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোন প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফিররা তাদের পালনকর্তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেনঃ এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেনঃ এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মনযিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র যিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তিস্বরূপ একথা বলা হত না যে, তারা আল্লাহ্র যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে ব্যক্তি কারও যিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করা কোন শাস্তি নয়।

إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ —কারও কারও মতে عليين -শব্দটি علو-এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র)-র মতে এটা এক জায়গার নাম —বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আযেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ ও আমল-নামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتَابٌ مَّرْقُومٌ —বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তফসীর নয়— সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ বাক্যে এই আমল-নামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ —يشهد -শব্দটি شهود -থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্ম-শীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করবে।— (কুরতুবী) شهود --এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يشهده-এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লি-য়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফির-দের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: শহীদগণের রূহ্ আল্লাহ্র সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছে:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي —এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ্ জান্নাতে থাকবে। সবগুলোর সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহ্কে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

انما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى ترجع الى

جسده يوم القيامة —মু'মিনের রূহ্ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মসনদে আহমদ ও তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? ঃ এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফিরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى —এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফিরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন—সপ্তম যমীনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে. জাহান্নামও সপ্তম যমীনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফিরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম—একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরোক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের